ঢাকাই চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ

খান ফেরদৌসর রহমান

ভূমিকা

যেকোনো শিল্পের উদ্দেশ্যই হলো অভিজ্ঞতা ও বোধকে নাড়া দেয়া। সৌন্দর্য প্রকাশের মধ্যেই শিল্পের অস্তিত্ব নিহিত। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন বলেই শিল্পের দর্শন নিয়ে তাঁর আলোচনা এখনো গ্রহণযোগ্য। শিল্প নির্দিষ্ট নয়, আপেক্ষিক। তাই তো বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে জীবনের জন্য শিল্প, না শিল্পের জন্যই শিল্প? মৌলিক নন্দনতত্ত্ব হিসেবে 'শিল্পের জন্যই শিল্প' (art for art's sake) মতটি এখন প্রতিষ্ঠিত হলেও, 'জীবনের জন্য শিল্প' (art for life) মতটিই প্রবল। আর সকল শিল্পমাধ্যমের মধ্যে নবীন ও আধুনিকতম শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। জনসংস্কৃতি (popular culture) হিসেবে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে এর বিকল্প নেই। বাংলাদেশের বিনোদন-বঞ্চিত মানুষের জন্য চলচ্চিত্রই বিনোদনের প্রধান মাধ্যম।

চলচ্চিত্র এমন একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যা মানুষের জীবনাচরণ এমনকি মানুষের বিদ্যমান মূল্যবোধকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। এটি মূলত বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদী সভ্যতার আবিষ্কার হলেও এই মাধ্যমটি ক্রমে এবং অংশত গণমানুষের শিল্পচেতনার আধারে স্থান করে নিয়ে এক প্রকার নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে ক্রমে এবং কালেভদ্রে এই মাধ্যমটিতে গণমানুষের শিল্পচেতনার স্বাক্ষরও প্রতিফলিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নব-আবিষ্কৃত চলচ্চিত্র মাধ্যমের বিস্ময় ও চমৎকারিত্বই এর যোগাযোগ সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। তবে স্থূল বাণিজ্যবুদ্ধির নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির কবল থেকে চলচ্চিত্র মাধ্যমটি কখনোই পুরোপুরি মুক্তি লাভে সক্ষম হতে পারে নি। 'চলচ্চিত্রে নারীর রূপায়ণ'— বিষয় হিসেবে সমকালীন চলচ্চিত্র বিশ্লেষক ও গবেষকদের কাছে একটি বিশেষ আগ্রহের বিষয়। চলচ্চিত্রের রূপালী পর্যায় নারীর 'আবেদনময়' উপস্থিতি নিয়ে বিশ্বের সর্বত্রই আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই।

বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় চলচ্চিত্রে বাহ্যিকভাবে উপস্থাপিত নারীর অবয়ব দেখে বিদ্যমান মূল্যবোধের বিপরীতে যৌনতার পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে কেবল তার নেতিবাচক ও অগ্রন্থিত সমলোচনাই বেশি গড়ে উঠেছে। 'অশ্লীলতা'বিরোধী প্রোপাগান্ডা ও সুস্থ সিনেমার আবহে ঢাকাই সিনেমার এই সংকটটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখছেন কেউ কেউ, আর এই বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে উৎপাদিত পণ্যের সাথে ভোক্তার, সংস্কৃতির সাথে জনসংস্কৃতির। চলচ্চিত্রের বর্তমান মান দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিশেষ করে নারী

দর্শকদের হলবিমুখ করেছে। তাই তো ঢাকাই চলচ্চিত্রে নারীর একক প্রাধান্য কিংবা নারী-পুরুষের যৌথ অংশগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্রভাবে নারীকে কতটুকু মুক্তি দিয়েছে তা বিবেচনার দাবি রাখে।

এই প্রবন্ধের বিস্তৃত উদ্দেশ্য (broad objective) হচ্ছে ঢাকাই চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করা। তবে বিস্তৃত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (specific objective) পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে :

- যথার্থ মর্যাদাসহ আত্মসম্মানের সাথে চলচ্চিত্রের পর্দায় নারীর ইমেজ কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা যাচাই করা;
- পর্দায় যেভাবেই নারীর ইমেজ সৃষ্টি হোক না কেন সে সম্পর্কে নারীর নিজস্ব মতামত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কতটুকু স্বাধীনতা থাকে তা খোঁজা; এবং
- চলচ্চিত্রে নারীর সৃষ্ট ইমেজের স্বরূপ সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা।

পূর্বসূরিদের কথা

চলচ্চিত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে গবেষিত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চগুলোর চলমান চিত্রায়ণ বিশ্লেষণ করা যায়। আর এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনধারা সম্পর্কে একটা চিত্র ফুটে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে গবেষিত অঞ্চলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের সত্যতা সম্পর্কে অধিকতর নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। চলচ্চিত্র গবেষণার তাত্ত্বিক বিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে জনসংস্কৃতির সাথে জড়িত। জনসংস্কৃতি যেহেতু প্রাক-শিল্পায়িত সমাজে লোকসংস্কৃতি (folk culture) এবং শিল্পায়িত সমাজে গণসংস্কৃতি (mass culture) নামে পরিচিত, তাই একে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে দেখেছেন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিকরা মনে করেন, জনসংস্কৃতি হলো গণসংস্কৃতি, যা তৈরি হয়েছে শিল্পায়নের প্রভাবে এবং তা শুধু পুঁজিবাদের স্থায়িত্ব ও গতিশীলতাকে সুনিশ্চিত করে। এই স্কুলের তাত্ত্বিকদের ধারণা মার্কসীয় তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন আলথুসার এবং গ্রামসি, যাঁরা জনসংস্কৃতি বলতে আধিপত্যবাদী মতাদর্শকেই মনে করেছেন। মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থনীতি (political economy) স্কুল এবং নারীবাদী তাত্ত্বিকরা জনসংস্কৃতিকে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের একটি নমুনা বলে মনে করেন, যা মূলত পুরুষতন্ত্রের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং নারীর স্বার্থের বিপরীতে কাজ করে। আবার উত্তর-আধুনিকতাবাদী তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, জনসংস্কৃতি গণমাধ্যমের ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে, যা বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝে বিদ্যমান দূরত্ব দূর করে থাকে।

প্রতিনিধিত্বশীল তত্ত্ব অনুযায়ী হাল (২০০০) মনে করেন, বাস্তবতা বলে আসলে কিছু নেই; বরং বাস্তবের নির্মিতি এবং নির্মাণ প্রক্রিয়া আছে। যতই বাস্তব বলে মনে হোক না কেন, সকল টেক্সটই আসলে 'নির্মিত বাস্তব'-এর প্রতিনিধিত্ব করে। আবার Simone De Beauvoir-এর মতে, পুরুষের মধ্যে বিলিন হয়ে থাকার কারণে নারীর স্বাভাবিক ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এবং এর ফলে এরা বেশি নিপীড়িত। এই প্রবন্ধটি মাধ্যমিক (secondary) তথ্য বিশ্লেষণ করে রচনা করা হয়েছে। আর এজন্য প্রকাশিত বিভিন্ন বই, সংবাদপত্র, জার্নাল, আর্কাইভ, ইন্টারনেট প্রভৃতির সাহায্য নেয়া হয়েছে।

বিচিত্র চরিত্রের 'অশ্লীলতা' কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে সংজ্ঞায়িত হয় নি এবং বাংলাদেশে এটি শুধু আইনের সাথে সম্পর্কিত। তবে শিল্পের রস একেক জনের কাছে একেক রকম, কখনোই তা সর্বজনীন নয়। তাই শৈল্পিক উপস্থাপনার বদৌলতে অনেক সময় অনেক 'অশ্লীল' বিষয় আবার শিল্প হয়ে যায়।

চলচ্চিত্রে নারীর ভূমিকা শুরু থেকেই সীমিত করে রাখা হয়েছে। হলিউডের ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকের চলচ্চিত্রে নারীর অবস্থান— পতিতা অথবা কুমারী— এই দুই ভূমিকায় সীমাবদ্ধ থেকেছে। চলচ্চিত্র মাধ্যমটি বিকশিত হবার পর এর আঙ্গিক ও আধেয়গত অনেক পরিবর্তন এসেছে, বিচিত্র বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। মূলধারায় রোমান্টিক, অ্যাকশন, হরর প্রভৃতি বর্ণনামূলক চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র এই মাধ্যমটিকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে চলেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চলচ্চিত্রে বিশেষত মূলধারার চলচ্চিত্রে নারীর ভূমিকা প্রায় অপরিবর্তনীয়ই রয়ে গেছে। যৌনতা, অর্থ ও অপরাধ— এই তিনটি বিষয়ের সাথে পুরুষতন্ত্র কর্তৃক সমাজে নারীকে সহজেই যুক্ত করে দেয়া যায়। চলচ্চিত্রে তাই নারীকে উপস্থাপন করা হয় যৌনতা ও অপরাধের অনুষঙ্গ হিসেবে। আমাদের বর্তমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো চলচ্চিত্রেও নারী লিঙ্গীয় বৈষম্যের শিকার। সেখানে তাকে অধস্তন করে রাখা হয়েছে। অনেক সময় পর্দায় তাকে বিকৃতভাবে বা যৌন আবেদনময়ী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

ধর্মনীতির অপব্যাখ্যাসহ সমাজনীতির স্বার্থন্বেষী প্রয়োগ বর্তমান শতাব্দীতেও প্রায় সকল দেশের নারীকে ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারের গহিনে। চলচ্চিত্রে মানুষের মানবিক সম্পর্কের যথাযথ মূল্যায়ন না করে, বরং একক সামাজিক সত্তা হিসেবে 'নারী'কে মানুষের চেয়ে পণ্য হিসেবে গণ্য করার প্রবণতাই বেশি দেখা যায়। সমাজ অর্থনীতির জটিল মেরুকরণে নারীরা এই অবস্থানে এক প্রকার নির্দিষ্ট হয়েই আছে। বিখ্যাত পরিচালকদের কাজেও বারবার উঠে এসেছে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর দুর্দশার চিত্র। উদাহরণস্বরূপ, কুরোশাওয়ার 'রশোমন' যে কয়টি মাত্রা নিয়ে দর্শকের কাছে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে, তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয় ধর্ষিতার লাঞ্ছনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং পরিণতি।

কাহিনিচিত্রে নগ্নতা ও যৌনতার রূপায়ণ অনেক সময় যেমন শিল্পসুষমা, ব্যঞ্জনা আর নান্দনিক উত্তরণ নিয়ে এসেছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই অশ্লীলতার অভিযোগে তুমুল বিতর্ক, প্রতিবাদ এবং সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। চলচ্চিত্রের নগ্নতার সাথে যৌনতার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, মূল ফ্রেমের কতটুকু অংশ জুড়ে নগ্নতা ও যৌনতার ইমেজ চিত্রিত করা হয় এবং কত সময় ধরে তা দর্শকের সম্মুখে প্রদর্শিত হয়— তার ওপর নির্ভর করে উক্ত ইমেজ দর্শকের মনে। ফ্রেমের আকার-আয়তন এবং স্থিতিসময়সহ আবহ সংগীতের ওপরও এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি নির্ভর করে। চলচ্চিত্রের উৎপাদনের সাথে ভোক্তার গ্রহণ-বর্জনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। বিপুল বিনিয়োগ আর বিস্তর মুনাফার বিশেষ ধরনের জন্যই চলচ্চিত্রশিল্পের সাথে বরাবরই মাফিয়াসহ নানা ধরনের অবৈধ অর্থের প্রবেশ গোচরীভূত হয়েছে। আর এ জন্যই বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে প্রথম থেকেই সেক্স-ফ্যান্টাসির উপস্থিতি চোখে পড়ে।

চলচ্চিত্রকে আশ্রয় করে এবং ব্যবহারের মাধ্যমে অনেকেই বিত্তবান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, যশ-অপযশের অনুষঙ্গে 'নাম'ও অর্জন করেছেন। কিন্তু এতে জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে কেবল নির্যাতিত নারীর চিত্রই বেশি উঠে এসেছে এবং মুক্তিযুদ্ধে নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা ঠিকমতো প্রতিফলিত হয় নি। একাত্তরের

অব্যবহিত পরে নির্মিত এসব চলচ্চিত্রে পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক এ দেশের নারী নিগ্রহের বিষয়টিকে 'বাণিজ্যিক উপাদান' হিসেবে প্রয়োগের প্রবণতা দেখা যায়। মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে নারীকে নিয়ে এরকম অবমাননার ঘটনা বিরল। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারীরাও তাঁদের স্ব-স্ব অবস্থানে থেকেও অনবদ্য অবদান রেখেছেন। কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ চলচ্চিত্রেই তাঁদের সেই অবদানকে মূল্যায়ন করা হয় নি, বরং অপমানই করা হয়েছে বেশি।

দীর্ঘসময় ধরে এ দেশের বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে নারীর প্রতি বৈরী আচরণ করা হয়েছে, যদিও সম্প্রতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন পরিচালকের কিছু সংখ্যক চলচ্চিত্রে নারীর যথার্থ অবদানসহ বিচিত্র ধরনের ত্যাগ-তিতিক্ষার উপযুক্ত চিত্রায়ণ লক্ষ করা যায় (ইসলাম, ২০১১)। ১৯৯০-এর দশকে এসে ডিশ এন্টেনার আবির্ভাব এবং একই সময়ে ভিসিআর এবং পরবর্তী সময়ে ভিসিডির কল্যাণে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার ফলে বিনোদনের জন্য দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে যাবার প্রয়োজন কমে আসে। ঢাকাই চলচ্চিত্রের চিহ্নিত সংকটসমূহের মধ্যে এফডিসির দুরবস্থা, চলচ্চিত্র তৈরি ও বিপণনের ক্ষেত্রে নানা অব্যবস্থাপনা, সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি অন্যতম। হোয়েক (২০১০) দেখিয়েছেন যে, গত শতাব্দীর আশির দশকে প্রদর্শনের সময় ঢাকাই চলচ্চিত্রে 'কাটপিস' নামে খ্যাত অঅনুমোদিত অশ্লীল দৃশ্যের ব্যবহার শুরু হয়। এভাবেই ঢাকাই চলচ্চিত্রের বিপরীতে অনেক শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটে।

শুরু থেকে এ যাবৎ বাংলাদেশে নির্মিত প্রায় হাজার তিনেক পূর্ণদৈর্ঘ্য বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের মধ্যে নারীর উপস্থিতি লক্ষ করবার মতো। কিন্তু চলচ্চিত্রের সংখ্যা এবং পর্দায় প্রতিফলিত সময়ের ব্যাপ্তিতে নারীর অবস্থান ইতিবাচক হলেও বর্ণিত সংখ্যা কিংবা ব্যাপ্তির মধ্যে নারীর যে ইমেজ চিত্রিত হয়েছে তা মোটেই ইতিবাচক নয়। এ সকল চলচ্চিত্রের অধিকাংশেই পুরুষের প্রাধান্য এবং মূলত পুরুষের প্রেম-ভাবনা ও যৌন আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় নারীর অবস্থান থেকে অবস্থান্তর ঘটে। অর্থাৎ প্রতিটি চলচ্চিত্রেই পুরুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ক্রীড়নকে পরিণত হয় নারী। নারী সেখানে আবর্তিত হয় অস্তিত্বের সংকটে, যা মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক নয়; বরং শারীরিক শক্তি এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্যের। নারী প্রাকৃতিক কারণে পুরুষ থেকে ছোট— এই ধারণা চাপিয়ে দিয়ে যুগ যুগ ধরে নারীর ওপর নিপীড়নের মাত্রা বাড়ানো হয়েছে। আর 'সমতা' কেবল আন্তরিকতা ও অন্তঃসারশূন্য বিমূর্ত এক দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে মানবসমাজে প্রচলিত হয়েছে এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি কখনো কোথাও।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নৃতাত্ত্বিক স্বভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয় এবং সেখানে মানুষের মানবিক সম্পর্কের যথার্থ মূল্যায়ন ব্যতীত, নির্দিষ্ট করে বললে একক সামাজিক সত্তা হিসেবে 'নারী'কে পণ্য হিসেবে গণ্য করার প্রবণতাই বেশি লক্ষণীয়। তাই চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দায় নারীর কথিত আবেদনময়ী উপস্থিত চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় 'নারী'র এমন সরব উপস্থিতিতে প্রচ্ছন্ন শক্তিরূপে পুরুষতন্ত্রই প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অনেক ক্ষেত্রে নারী নির্মাতাও এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। চলচ্চিত্রে পরাধীন নারীর কথিত ইমেজের সঙ্গে আমাদের গ্রহণশক্তির অসঙ্গতির কারণে তাকে কখনো 'অশ্লীল', কখনো 'আপত্তিকর' ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়। সুলতানা (২০০২) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, অশ্লীলতার দায়ে দুষ্ট ঢাকাই চলচ্চিত্রশিল্প নারীকে যথেচ্ছ ব্যবহার করার মধ্য দিয়েই তার 'অশ্লীল' পরিচয়টি অর্জন করেছে এবং যেখানে পুরুষ হলো 'দানব', 'দেবতা' ও 'পতি' এবং নারী হলো 'নষ্টা', 'এক্সট্রা' ও 'সতী'।

আজম (২০১১)-এর মতে, ঢাকাই সিনেমায় 'অশ্লীলতা' সম্পর্কে ভদ্রসমাজের প্রোপাগান্ডা প্রথম ব্যাপকভাবে নজরে আসে একটি প্রভাবশালী জাতীয় দৈনিকের রম্য ম্যাগাজিনে 'ছিঃনেমা' শিরোনামের নিয়মিত কলামে। তিনি মনে করেন যে, বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্ম অশ্লীলতাবিরোধী প্রোপাগান্ডার মধ্যেই বড়ো হয়েছে এবং বাংলা মুল্লুকে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে মোল্লা-মৌলবিদের প্রতিরোধ আর সিনেমার অশ্লীলতার বিরুদ্ধে রুচিবান মধ্যবিত্তের প্রোপাগান্ডা প্রায় সমসাময়িককালে প্রবলভাবে চলেছে। আর এ জন্যই অশ্লীলতাবিরোধী যেকোনো প্রোপাগান্ডাও শ্রেণিচরিত্রে আবদ্ধ। তাঁর বিবেচনায়, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার দু-তিন কোটি ভদ্রলোক (এখানে বিলাসপণ্য ক্রয়ের ক্ষমতাধারী বোঝানো হয়েছে), আর বাকি সব আমজনতা। এই দু'পক্ষের সাংস্কৃতিক পার্থক্যই মোটাদাগে 'সুস্থ' ও 'অশ্লীল' চলচ্চিত্রের পার্থক্য এবং সেই হিসেবে এ দেশে অশ্লীল চলচ্চিত্রের দর্শকই সংখ্যাগরিষ্ঠ, যদিও নানা কারণে এদের একটা বড়ো অংশ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে না। ফলে 'অশ্লীলতা'বিরোধী প্রোপাগান্ডার ফলে সামগ্রিকভাবে বাংলা সিনেমার প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে 'সুস্থ' সিনেমার চর্চার ফলে মোট দর্শকশ্রেণিতে দুরারোগ্য ব্যবধান তৈরি হয়েছে। নাসরীন এবং হক (২০০৮) মনে করেন যে, শুধু নিম্নবিত্তের মানুষ নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি চলচ্চিত্রের বিষয়ে যতই উন্নাসিক ভাব দেখাক না কেন, কোনো না কোনোভাবে সে ঢাকাই চলচ্চিত্র কনজিউম করে, আস্বাদন করে, উপভোগ করে। আবার রাজু (২০১৩) দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের জনপ্রিয় কিংবা বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র একদিকে অসংখ্য দর্শককে বিনোদিত ও আপ্লুত করে, যাদের বেশিরভাগই স্বল্প আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ; অন্যদিকে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা একই ধারার চলচ্চিত্রের গল্প, কাঠামো কিংবা তারকাদের নিয়ে বেশিরভাগ সময়ই ঠাট্টা-তামাশায় ব্যস্ত।

বিশ্লেষিত ফলাফল

- নারীর ইমেজ, পর্দায় প্রতিফলিত সকল কর্মকাণ্ড, অভিব্যক্তি, দর্শন ইত্যাদি সবই আরোপিত, যদিও নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল আজকের এই সভ্যতা। আর এভাবেই ঢাকাই চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণের প্রবণতা লক্ষণীয়; উল্লেখযোগ্যভাবে সেখানে নারীর উপস্থাপন খণ্ডিত এবং মাত্র কয়েকটি দৃশ্যমান ব্যতিক্রম বাদ দিলে অন্যান্য ক্ষেত্রে তা অবমানকর।

- ঢাকাই চলচ্চিত্রের বেশিরভাগ দর্শক নিম্নবিত্ত শ্রেণির খেটে খাওয়া মানুষ; আর সেখানে নারী মুখ্য নয়, গৌণ মাত্র। এমনকি ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মিত সমাজব্যবস্থায় বিশেষ করে নয়া উদারতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এ যুগে ফেয়ারনেস ক্রিমের চটকদার বিজ্ঞাপন যেখানে কালো মেয়েদের প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয় যে, তুমি অসুন্দর তুমি কালো, সেখানে কালো কোনো মেয়েকে চলচ্চিত্রের মূলে উপস্থাপন অনেকটাই বিপরীতধর্মী প্রচেষ্টা।

- বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারীকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, সেটাকে চরিত্রচিত্রণ বা প্রোট্রেইয়াল বলে। অর্থাৎ সেখানে আমরা নারীর উপস্থাপিত রূপটি দেখতে পাই, কিন্তু সেখানে তার কোনো অংশগ্রহণ চোখে পড়ে না। এখানে নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা বিচারে নারী চরিত্রের ইতিবাচক ইমেজের চিত্রণ খুব কমই চিত্রিত হয়েছে এ কথাও নির্দ্বিধায় বলা যায়।

- ঢাকাই চলচ্চিত্রে নারী দুর্বল, পুরুষের অধস্তন, পুরুষনির্ভর, পশ্চাৎপদ, নিম্নবর্গ (subaltern) ইত্যাদি ইমেজে উপস্থাপন করা হয়। আর এভাবেই যৌনতা, অশ্লীলতা এবং ভোগ্যপণ্য হিসেবে ঢাকাই চলচ্চিত্র নারীকে কামনার সামগ্রী হিসেবে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট।

- এখানে মূলধারার চলচ্চিত্রেও ধর্ষণকে আবশ্যিক উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, কারণ ধর্ষণ হলো নারীর প্রতি পুরুষের সহিংসতা, নির্যাতন, সুপিরিয়টিরি ও সর্বোপরি হেজিমনি প্রকাশের সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র। তা ছাড়া, নিকট অতীতে যৌন সুড়সুড়ি দেবার জন্য 'কাটপিস' অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

উপসংহার

চলচ্চিত্র তথা গণমাধ্যমের সুস্থতার সাথে নারীর অবস্থানের সম্পর্ক জড়িত। নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করে চলচ্চিত্রের সুস্থ পরিবেশ আশা করা যায় না। চলচ্চিত্রকে সাধারণ মানুষের সত্যিকার জীবনযাপনের আখ্যানে পরিণত করতে হলে প্রয়োজন একটি সমন্বিত পরিকল্পনা।

খান ফেরদৌসর রহমান সহকারী অধ্যাপক, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। ferdous@sub.edu.bd

তথ্যসূত্র

- আজম, মোহাম্মদ ২০১১, অশ্লীলতা-বিরোধী প্রপাগান্ডা ও 'সুস্থ' চলচ্চিত্রের যুগে ঢাকাই সিনেমা, *যোগাযোগ*, সংখ্যা ১০, জানুয়ারি।
- ইসলাম, আহমেদ আমিনুল ২০১১, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারীর ইমেজ চিত্রায়ণ, *মহিলা পরিষদ জার্নাল*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।
- নাসরীন, গীতি আরা এবং হক, ফাহমিদুল ২০০৮, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প : সংকটে জনসংস্কৃতি*, ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী।
- রাজু, জাকির হোসেন ২০১৩, বাংলাদেশের জাতীয় সিনেমা : জঁরা ও জাতীয়তার সন্ধানে, *যোগাযোগ*, ১১:৮৩-৯০।
- সুলতানা, শেখ মাহমুদা ২০০২, ঢাকার চলচ্চিত্রে নারী : দানব, দেবতা ও পতির রাজ্যে নষ্টা, এক্সট্রা ও সতী, গীতি আরা নাসরীন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *গণমাধ্যম ও জনসমাজ*, ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী।
- হাল, স্টুয়ার্ট ২০০০, কালচারাল আইডেন্টিটি অ্যান্ড সিনেমাটিক রিপ্রেজেন্টেশন, ইন রবার্ট স্টাম অ্যান্ড রবি মিলার (সম্পাদিত), *ফিল্ম অ্যান্ড থিওরি*, অক্সফোর্ড : ব্লাকওয়েল, পৃষ্ঠা ৭০৪-১৪।
- হোয়েক, লোটে ২০১০, আনস্টাবল সেলুলয়েড : ফিল্ম প্রজেকশন অ্যান্ড দ্য সিনেমা অডিয়েন্স ইন বাংলাদেশ, *বায়োস্কাপ*, ১(১) : ৪৯-৬৬।